রেভারেন্ড লালবিহারী দে

জলধর মল্লিক

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ মুখবন্ধ ॥

দুজনেই ছিলেন উনিশ শতকের উজ্জ্বল নক্ষত্র। এদের একজন জন্মেছিলেন ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। অন্যজন জন্মেছিলেন ১৮২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর। দুজনেই ছিলেন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। দুজনেরই জন্ম হয় কলকাতা থেকে দূরে গণ্ডগ্রামে। দুজনের পিতাই কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকার কারণে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বুঝেছিলেন, পুত্রকে ইংরেজি ভাষাটা ভালো করে শেখাতে পারলে পরবর্তী জীবনে নিশ্চিত আয়ের একটা সুযোগ খুঁজে পাবে। পাবে সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি। আর এই বিশ্বাসে ভর করেই দুজনের পিতাই তাদের নিজ নিজ পুত্রকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। কলকাতার নামকরা স্কুলে ভর্তিও করে দেন। ঘরে আলো জ্বালাবার সামর্থ্য না থাকায় প্রথম জন রাস্তার আলোর নীচে পড়াশোনা করেন। দ্বিতীয় জনের বই কেনার সামর্থ্য না-থাকায়

সহপাঠীদের কাছ থেকে বই ধার নিয়ে পড়তে হয়। তবে হ্যাঁ, পরবর্তীকালে প্রথম জন যখন সেই সময়ে শিক্ষিত সমাজের শিরোমণি হয়ে উঠেছেন তখনও তিনি পিতৃসঙ্গ লাভে বঞ্চিত হননি। কিন্তু অন্যজন? তেরো পেরিয়ে চোদ্দো বছরে পড়েছেন, সেই সময়েই পিতৃহারা হলেন। এই সহায়সম্বলহীন পিতৃহারা সন্তানটি কেবলমাত্র মেধার জোরে পাওয়া বৃত্তির ওপর নির্ভর করে উচ্চশিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করেছেন। এমন কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না যে তাকে সঠিক উপদেশ দিয়ে বা অর্থদান করে সাহায্য করেন। প্রথমজনের নাম যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যজনের নাম রেভারেন্ড লালবিহারী দে।

দুজনেই আজীবন বাংলার সমাজ কাঠামোটাকে সংস্কার করে বাসযোগ্য করার চেষ্টা করে গেছেন নিজ নিজ পদ্ধতিতে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে দুজনেই ছিলেন অগ্রণী সৈনিক। কিন্তু রেভারেন্ড লালবিহারী দে বিদ্যাসাগরের থেকে একদম এগিয়ে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি তুলে ছিলেন ইংরেজ সরকারের কাছে। আর রেভারেন্ড লালবিহারী দে-ই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এই বিষয়টি ভারতে প্রথম উত্থাপন করে বলেন যে, এটা না করতে পারলে সমাজের পিছিয়ে-পড়া, দরিদ্র অংশের সন্তানরা শিক্ষার আলো পাওয়া থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবে চিরকাল, লাভবান হবে কেবল শহরের মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তদের সন্তানরা। শিক্ষার ব্যয়বহনের জন্যে 'শিক্ষা সেস' চালু করার সুপারিশ করতে একটুও

দ্বিধা করেননি তিনি। সংস্কৃত, ইংরেজির পাশাপাশি প্রধানত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যুগান্তকারী অবদানের জন্য বিদ্যাসাগরকে কোনো বাঙালির সঙ্গে, বিশেষত সাক্ষর কোনো বাঙালির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। অন্যদিকে রেভারেন্ড লালবিহারী দে প্রধানত ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য, সাংবাদিকতা, শিক্ষা-বিস্তারের কাজ করেছেন, বিশেষত ভারতীয় সমাজকে ইংরেজদের ঠিকঠাক চিনিয়ে দেওয়ার কাজে ইংরেজি ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। ফলে, ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে দক্ষ বাঙালি বা ভারতীয় সমাজের মানুষ, যারা সংখ্যায় নেহাতই স্বল্প ছিলেন, তারা কিন্তু জানতেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে-কে, চিনতেন তার কলমকে। আর জানতেন, এদেশে আগত ইংরেজ প্রশাসকরা, বুদ্ধিজীবীরা, জানতেন ইংলন্ডে বসবাসকারী ইংরেজ সাহিত্যিক ও ইংরেজদের সংবাদপত্র জগত, যে রেভারেন্ড লালবিহারী দে নামে একজন বাঙালি লেখক আছেন যিনি, ইংরেজ সাহিত্যিকের থেকেও উচ্চস্তরের নির্ভুল ইংরেজি লিখতে পারেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার কর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্যে আচার-আচরণে, পোশাকে-আশাকে খাঁটি বাঙালিয়ানাকে অবলম্বন করেছিলেন। কর্মসিদ্ধির জন্যে তাকে ঈশ্বর বা অলৌকিক কোনো শক্তির ওপর নির্ভর করতে কখনো দেখা যায়নি। অন্যদিকে, রেভারেন্ড লালবিহারী দে তার লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন, সেই ধর্মের প্রতি অনুগত

থেকেছেন আজীবন। এক পার্শি ক্রিশ্চান মহিলাকে বিবাহ করেছেন, ইংরেজদের মতো জীবনযাপন করেছেন।

এদেশে জনপরিচিতির ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের জন্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র হয়ে ওঠেন যেন মধ্যাহ্নের সূর্য। আর রেভারেন্ড লালবিহারী দে? তিনি যেন হয়ে ওঠেন মেঘে ঢাকা এক তারা।

এই মেঘের আড়ালটুকু সরিয়ে দেশপ্রাণ, সমাজমনস্ক রেভারেন্ড লালবিহারী দে-কে একালের পাঠকের কাছে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার জন্যেই এই বইটি লেখা। বইটির প্রকাশক শ্রীশঙ্করীভূষণ নায়ক মহোদয়ের বারংবার অনুরোধের ফলেই বইটি লিখতে উৎসাহিত হই। আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী পূরবী মল্লিক এই বইটি লেখার ক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে সহায়তা করায় তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বইটি পড়ে পাঠকপাঠিকাদের ভালো লাগলে লেখার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

কলকাতা,
জানুয়ারি, ২০১০

বিনীত
জলধর মল্লিক

সূচিপত্র

কে ইনি?	১৩
শৈশব পর্ব	১৫
কলকাতায় শিক্ষার অঙ্গনে	২৩
খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ	৪৪
খ্রিস্টধর্ম প্রচারকের ভূমিকায়	৫০
বিবাহ	৫৩
শিক্ষাব্রতীর ভূমিকায়	৫৮
সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও পত্রিকা সম্পাদকের ভূমিকায়	৬১
অন্তিম পর্ব	৯৫
শ্রদ্ধাঞ্জলি	৯৭
পরিশিষ্ট	১০০

(ক) রেভারেন্ড লালবিহারী দে রচিত 'বাংলার লোককথা' পুস্তকের প্রাক্‌কথন

(খ) রেভারেন্ড লালবিহারী দে রচিত 'বাংলার লোককথা' পুস্তকের একটি আখ্যান —এক হীরামনের গল্প

(গ) রেভারেন্ড লালবিহারী দে রচিত 'বাংলার লোককথা' পুস্তকের আরো একটি আখ্যান—ঝোলায় বাঁধাপড়ার ভয়ে কাতর এক ভূত

কে ইনি?

বাংলার বাতাস, জল, মাটি আর মানুষের গন্ধমাখা,
বাংলার মানুষের আপন সৃষ্টি,
যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে ফেরা,
প্রাণ-ভরানো মনভুলানো লোককথাকে কে প্রথম
বিশ্বের দরবারে হাজির করেছিলেন?
কিংবা কে তিনি যিনি বাংলার নিপীড়িত রায়তদের
জীবনকথাকে উপন্যাসের আকারে সর্বপ্রথম দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছিলেন আকর্ষণীয় এক তথ্যচিত্রের মতো?

কোন বঙ্গ সন্তানের লেখা উপন্যাস পড়ে মহাবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন?

আর কেই-বা সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার স্বপক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন উচ্চকণ্ঠে?

রেভারেন্ড লালবিহারী দে ॥ ১৩

সুদূর এক গাঁয়ের নিম্নবিত্ত এক পরিবারের সন্তান হয়েও পরম অধ্যবসায়ের জোরে, অবিচল নিষ্ঠাকে অবলম্বন করে, আপন মেধা আর আস্থার শক্তিতে নির্ভর করে এমনি সব ইতিহাস যিনি সৃষ্টি করে গেছেন, তিনি হলেন এই বাংলারই এক সুসন্তান—রেভারেন্ড লালবিহারী দে।

শৈশব পর্ব

রেভারেন্ড লালবিহারী দে জন্মেছিলেন সোনপলাশি নামে এক গণ্ডগ্রামে। সোনপলাশি হল বর্ধমান জেলার একটা গ্রাম। কলকাতার পশ্চিমে বয়ে চলেছে হুগলি নদী, যাকে চলতি কথায় মানুষ 'গঙ্গা' বলে থাকেন। এই হুগলি নদীর অপর পাড়ে হাওড়া শহর। হাওড়া থেকে ৯৫ কিলোমিটার দূরে দামোদর নদের তীরে নানান ইতিহাসে সমৃদ্ধ শহরটির নাম বর্ধমান। আর এই বর্ধমান থেকে ১৩/১৪ কিলোমিটার দূরে সোনপলাশি গ্রাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতা থেকে এই রকম দূরে থাকা এই সব গ্রাম কত যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, কত যে দুর্গম ছিল, সেকথা এখন আর কল্পনাও করা যায় না। তখনও ভারতে রেলগাড়ি বলে কোনো কিছুর নামগন্ধ নেই। খাস বিলেতেই তখন রেলগাড়ি চালু হয়নি তো ভারত কোন ছার্। ঐখান থেকে কলকাতায় আসতে

তখন দিন তিনেক লেগে যেত। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! খানিকটা হেঁটে, খানিকটা গোরুর গাড়িতে, বাকিটা গঙ্গার বুকে নৌকোয় পাড়ি দিয়ে কলকাতার কোনো এক ঘাটে উঠতে হত। তবুও এমন একটা অখ্যাত, অনামী গ্রাম একটি মাত্র মানুষের জন্যে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেয়। সে মানুষটির নাম যে রেভারেন্ড লালবিহারী দে, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'দে' পদবী থেকেই বোঝা যায়, সোনপলাশি গ্রামের 'দে' পরিবারে সন্তান ছিলেন তিনি। ১৮২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই 'দে' পরিবার জাতিতে সুবর্ণবণিক। গ্রামটিও, বলতে গেলে, সুবর্ণবণিক প্রধান। বংশগত উপাধি 'দে'-এর পাশাপাশি এই পরিবারের নবাবের দেওয়া আরো একটি উপাধি ছিল। সেটি হল—'মণ্ডল'। এই পরিবারটির বংশানুক্রমে দীর্ঘদিন ধরে এই গ্রামে বসবাস করে আসছেন। রেভারেন্ড লালবিহারী দে-র পূর্বপুরুষদের বসবাস যেমন এই গ্রামেই, তেমনি আবার তার মামার বাড়িটিও ছিল এই গ্রামেই। এখনও এই গ্রামে গেলে দেখা মেলে তার পৈতৃকবাড়ি 'মণ্ডলবাটি'-র। দেখা মেলে—'মণ্ডলপুকুর' ও 'দে-পুকুর' নামে দুটি পুষ্করিণীর।

যত দূর জানা যায়, লালবিহারীর প্র-প্রপিতামহের নাম ছিল বৈষ্ণবচন্দ্র দে মণ্ডল। খেলারাম দে মণ্ডল ছিলেন বৈষ্ণবচন্দ্র দে মণ্ডলের পুত্র। এই পরিবারের কথা উঠলে মনে পড়ে যায় সেই ছড়াটির কথা—

ছেলে ঘুমোল, পাড়া জুড়োল, বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?

বর্গীদের হামলায় তখন বাংলার দক্ষিণ অঞ্চল রীতিমতো কম্পমান। ১৭৪৫ সাল নাগাদ যখন এই বর্ধমান জেলায় বর্গীদের হাঙ্গামা হয়, সেই সময় খেলারাম দে মণ্ডলের পুত্র লালবিহারীর প্রপিতামহ গোকুলচন্দ্র দে মণ্ডল নিজের গ্রাম সোনপলাশি ছেড়ে সপরিবারে ঢাকায় চলে যান। শোনা যায়, এই গ্রামে নাকি বর্গীরা ব্যাপক ভাবে লুটপাট চালিয়েছিল। গোকুলচন্দ্র দে মণ্ডলের পুত্র গোলকচন্দ্র দে মণ্ডল হলেন লালবিহারীর পিতামহ। ঢাকাতেই গোকুলচন্দ্র দে মণ্ডল দেহরক্ষা করেন। গ্রাম ছেড়ে গোকুলচন্দ্রেরা চলে যাবার পর ষাট বছর পরে তার পুত্র গোলকচন্দ্র শোনপলাশি গ্রামে ফিরে আসেন। গোকুলচন্দ্রের ছিল তিনটি পুত্র—বড়োটির নাম কমললোচন, মেজোর নাম রাধাকান্ত আর সব থেকে ছোটোটির নাম ছিল বেণীমাধব। গোকুলচন্দ্রের মেজো ছেলে রাধাকান্তই হলেন লালবিহারীর বাবা। লালবিহারীর বাবা রাধাকান্তের জন্ম হয় ঢাকাতেই আনুমানিক ১৭৮২ সালে। ঢাকাতেই তার বিবাহ হয়। দুটি সন্তানও হয়। দুঃখের কথা, অল্পকালের মধ্যেই রাধাকান্তের স্ত্রী ও সন্তান দুটি মারা যায়। ১৮০৫ সাল নাগাদ তিনি যখন পিতা গোলকচন্দ্রের সঙ্গে ফিরে আসেন তখন রাধাকান্ত বছর তেইশের এক যুবক। এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। শেষমেশ আত্মীয়স্বজন আর প্রতিবেশীদের অনুরোধে বিপত্নীক রাধাকান্ত এই গ্রামেরই এক কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের সময় কন্যার বয়স ছিল ১৬ বছর আর রাধাকান্তের বয়স তখন ৪২ বছর। রাধাকান্তের